ভাঙা ডালে সূর্য বসাও

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

অণ মিত্র আমাদের এক আশর্চ্য বন্ধু , আর, সকলেরই এক আশর্চ্য কবি। তার চেয়ে বেশি, তিনি এক আশর্চ্য মানুষ। মানুষ কিছু কম দেখি নি, স্বদেশে বিদেশে, ছোটো, মাঝারি, বড়ো, নানা মাপের, নানা রঙের, নানা ভাষার। কিন্তু অণ মিত্রের মতো মানুষ আর দেখি নি বড়ো একটা।

বন্ধুর কথাই ধরা যাক। তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। আমার পিতৃতুল্য অনেকেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তিনি। আবার আমার পুত্রতুল্য যারা তাদের মধ্যেও ছিল তাঁর অনেক বন্ধু। ঘরে, ঘরোয়া পরিবেশে মনে হত তিনি তাঁর কন্যা-জামাতা উমা ও আশিসেরই সবচেয়ে বন্ধু। ভুল ভেঙে যেত বিলেত থেকে তাঁর বিবিসি-সাংবাদিক নাতনিটি, বুলা, যার নাম উর্বী, যখন আসত। বোঝাই যেত অণদা তাঁর ঘনিষ্ঠতম বান্ধবীটিকে পেয়ে একেবারে ভরভরাট হয়ে আছেন। যেমন পাত্তা পেতে আমরা অভ্যস্ত, ঠিক তেমনটি যেন আর পেতাম না তখন। কেমন বিষণ্ণ বোধ হত। সে বিষণ্ণতায় হয়তো কিছু ঈর্ষাও মিশে থাকত। তারপর হঠাৎ গিয়ে যখন দেখতাম, একেবারে শিশু হয়ে গিয়ে একানববই বছর প্রায় হামাগুড়ি দিয়েই খেলা করছে সত্যিকারের হামাগুড়ির বুলাপুত্র মেঘদীপের সঙ্গে এবং হাসছে তারই মতো সরল হাসি, তখন সব ঠিক হয়ে যেত। একটু যেন আরাম বোধ করতাম ভেতরে ভেতরে।

উমা-বুলা-মেঘদীপকে নিয়ে এত ফাঁদার, আসল কারণটা কী? নিজের ছেলে-মেয়ে-জামাই-নাতিপুতিকে কে না ভালোবাসে? শুধু মানুষ তো নয়, ঘোড়া-কুকুর-বানর-বেড়ালও বাসে। আসল কারণ আমাদের ওই ঈর্ষাটুকু এবং ভেতরের আরামটুকু। আমাদের ভাগে কম পড়ে যাচ্ছে, অথচ তেমনটি তো হওয়া কথা নয়, তাই ঈর্ষা। তেমনটি হওয়ার কথা নয়, কারণ অণদা আমাদেরও সমান বন্ধু এবং আমরাও অণদার। এই কথাটা সকলেরই জানা, সত্যেন মজুমদার থেকে জয় গোস্বামী, সুদেষ্ণা বসু পর্যন্ত সকলের। মাঝখানে আছেন আরও কতজন। কেউ ভীষণ নামী, এক ডাকে চেনে সবাই, পল এলুয়ার-এর মতো কবি থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো নাট্যকার-নেতা পর্যন্ত। আবার বহুজন আছেন যাঁদের নাম কস্মিনকালেও কেউ শোনে নি। কিন্তু অণদার বন্ধু সবাই। অণদা তাঁদের সবাইকেই জানতেন এবং ভালোবাসতেন। এবং রেখাটির দু'ধারে সকলের জন্যেই সর্বদা তাঁর মুখে লেগে থাকত তাঁর বিখ্যাত সেই হাসি, যে-হাসি কখনো মনে হত শিশুর, কখনো মনে হত ঋষির।

কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-সমালোচক-বুদ্ধিজীবি বিদগ্ধ জনের কথা নাহয় বোঝা গেল। তাঁরা তো অণদার কাছে পেতেনই সোনাদানা। কিন্তু নামহীন, চালচুলোহীন, অণদার কবিতার ভাষায় 'হাঘরে হাভাতেরা' কী পেত তাঁর কাছে? কিছু তো পেতেই, নইলে তারা এমন করে তাঁকে ঘিরে থাকত কেন? কাছে পেলেই কাজকর্ম ফেলে তাঁকে ঘিরে বসে পড়ত কোন্ টানে, কিসের লোভে?

মানুষটা একটু অদ্ভুতই ছিলেন অণ মিত্র। কুষ্টিয়ার সরকারি খাঁচায় যখন থাকতেন তিনি আর শান্তিদি, উমা-আশিস নিজেদের কাছে ধরে নিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ছিলেন সেখানে, এবং বেশ হাসিমুখেই ছিলেন, বাজার করার নাম করেই চলে যেতেন বাজারে। গিয়ে জমে আড্ডা দিতেন। হয়তো কোনো দর্জি একটা টুল ঠেলে দিত তাঁর দিকে। কোনো হাঁড়িকুড়িওয়ালা এগিয়ে দিত তার নিজেরই জলচৌকিটা। কখনো বা গল্প চলত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই, গ্রাম থেকে আসা

সবজিওয়ালির সঙ্গে। শুতে একাই, তারপর জমে উঠত, গল্প করা হয়ে উঠত আড্ডা মারা।
একবার অণদার কবিতার এবং গদ্যের এক ভক্ত, শুধু ভক্ত নন, রীতিমতো বোদ্ধা ভক্ত, সেখানে গিয়ে হাজির। অণদা উঠে যেতেই তিনি গিয়ে ধরলেন ওদের। তোমরা যে ওর সঙ্গে সমান তালে গল্প করো, আড্ডা মারো, পিঠটিও তো চাপড়ে দাও দেখলাম, তা তোমরা কি জান উনি কে? উনি কী? কত বড়ো, কত গুণী, কত বিখ্যাত মানুষ উনি, তা জানা আছে তোমাদের?
ওরা সব ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে । বাবুর এসব কথার মানেই বা কী, উত্তরই বা কী, মাথামুণ্ডু ভেবে পায় না। সবচেয়ে প্রবীণ যিনি তিনি খুব নম্র গলায় বলেন, আজ্ঞে উনি কে তা তো ঠিক জানি না, তবে উনি কী তা আমাদের জানা।
কী উনি?
ওমা, বাবু বুঝি তা জানেন না! উনি মধুর একটি ভাণ্ড। সেই মধু বিলোতেই তো আসেন এখানে।
বুদ্ধিমান বোদ্ধাটি থ'! বলে কী এরা?
অণদা ছিলেন ওঁদের কাছে মধুর ভাণ্ড আর ওঁরা ছিলেন অণদার 'জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার'। জীবনানন্দের মতোই তিনি ভাবতেন, 'শূন্য করে চলে যাব জীবনের প্রচুরভাঁড়ার।' তাই গেছেন তিনি। চেটেপুটে খেয়ে গেছেন। এক হাতে কুলোয় নি, দু-হাতই লাগিয়েছেন।
সেইজন্যেই অণদার ভাবনায়, কল্পনায়, স্বপ্নে, জীবনে যেমন, তাঁর গদ্যে-পদ্যেও মানুষ, এইসব মানুষ, কেমন জীবন্ত হয়ে ঘুরঘুর করে। তারা কাঁদে, হাসে, কষ্ট পায়, রাগ করে, ভাবনায় পড়ে, উল্লসিত হয়, উদাসীন হয়ে যায়। যার দেখার মতো দৃষ্টি আছে সে দেখতে পায়, শোনার মতো কান আছে শুনতে পায় এসব। অণদা তো কোনো কথাই চেঁচিয়ে বলতেন না। কিন্তু তিনি নির্জনতার কবি ছিলেন না। ভিড়ের মানুষ কবি ছিলেন। মানুষ তাই ভিড় করে আসে তাঁর কবিতায়।
বাংলা ভাষার সেরা সম্পাদকের একজন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তণ অণের কাঁধে হাত রেখেছিলেন। অণদা ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। অনেকদিন কাটিয়ে দিয়েছিলেন প্যারিসের গুণীজনসঙ্গে। সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। গবেষণা করেছিলেন ফরাসি সাহিত্যের আধুনিক কবি ও কাল নিয়ে। দেশে ফিরে দীর্ঘদিন ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফলে, তাঁর স্বভাবে, আচরণে, চিতে, ভাবনায় একটা সফিস্‌টিকেশন এসে যেতেই পারে। এসে গিয়েছিলও। কিন্তু তা তাঁকে তাঁর নিজস্ব মাটি থেকে, মাটির গন্ধ থেকে আলাদা করে নিয়ে যেতে পারে নি কোথাও।
এমনটি যে ঘটবে তা যেন তাঁর বাল্যেই স্থির হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বাবার বাড়ি আর মামার বাড়ি--- দুই বাড়িই যশোহরে--- ছিল দুই ঘরানার, দুই মেজাজের বাড়ি। এক বাড়িতে সারাবেলা দস্যিপনা করে বেড়াত ছেলেরা। ঘুরে বেড়াত নদীনালা, খালবিল, আমজামের বাগানে। বড়োবাড়ি ছোটোবাড়ির নানা জনকে ডেকে বালক অণ দল পাকিয়ে ফেলত। তারপর চলত তাদের অভিযান। একবার তেমনই এক অভিযানে বেরিয়ে নারকেল গাছের মাথায় উঠে ফলের গায়ে হাত দিতেই লাল পিঁপড়ের দল হিটলারের 'পানাজের বাহিনী'র মতো আক্রমন করল অণকে। ডাব-নারকেল রইল মাথায়। প্রাণ বাঁচাতে নারকেল গাছ আঁকড়ে ধরে সে সড়সড় করে নেমে এল নীচে। গাছের ঘষায়, নামার দ্রুততায়, পেট আর বুকের চামড়ার অনেকখানি রয়ে গেল গাছের গায়ে।
আর-এক বাড়ি ছিল স্নিগ্ধ, বিদগ্ধ, হয়তো কিছু গম্ভীর। সেখানে রেডিওতে, কলের গানে গানে, নাটক। শান্ত, অভিজাত পরিবেশ। আলমারিতে বাঁধানো ভারতী, ভারতবর্ষ, দেশবিদেশের বই। সেখানে আসত নানা পত্রপত্রিকা।
বালক অণ সেখানেই প্রথম পরিচিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, কবির লেখার মাধ্যমে। পরিচয়েই প্রেম। এমনই প্রেম, পরে, তাণ্যে তিনি যখন কলকাতায় কলেজে পড়েন, কবিকে দেখতে চলে গেলেন হাওড়া স্টেশনে।
ভিড়ে, ধাক্কাধাক্কিতে খোয়াতে হল হাতঘড়িটি। এক শুভানুধ্যায়ী সে কথা শুনে যখন হায় হায় করে উঠলেন, যুবক তণ তাঁর সেই হাসিটি হেসে বললেন, কী আশ্চর্য, কবিকে তো দেখতে পেলাম!
অণ মিত্রের জীবন যেমন, লেখাতেও তেমনই দুই জীবন, পায়ে কাদা মাখা, বুকে পিঠে পিঁপড়ের কামড় খাওয়া জীবন এবং অভিজাত চি, বোধ আর বুদ্ধিমোড়া জীবন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সেই জীবনই হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবন, একান্তভাবে তাঁরই নিজস্ব জীবন।

এই জীবনই ছিল তাঁর সেই ভাঁড়ার, সব রসের উৎস। গল্প, আড্ডা, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, অনুবাদ, হাসি, দুঃখ, ক্রোধ, ভালোবাসা--- সব-কিছুর উৎস। এই জীবনবোধ বুকে নিয়ে এই জীবনেই বাস করতেন তিনি। এর থেকে দূরে গেলে তিনি যেন আর ততটা অণ মিত্র থাকতেন না। যেমন করে এবং যত লিখতে চাইতেন, তা যেন বাংলার এই মাটির গন্ধহারা লিখে উঠতে পারতেন না।

সহজভাবে কথাটা বোঝা যায় তাঁর লেখা বইপত্র এবং তা প্রকাশের কালের দিকে তাকালে। ১৯৪৮ সালে ফরাসি সরকারের বৃত্তি নিয়ে প্যারিসযাত্রার আগে তাঁর কাছে আমাদের প্রাপ্তি মাত্র একখানি কবিতার বই, 'প্রান্তরেখা' (১৯৪৩)। তখন তিনি চৌত্রিশ বছরের যুবক।

১৯৪৮ সালে গিয়ে তিনি ফিরে আসেন ১৯৫১ সালে। সে বছরই যোগ দেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কুড়ি বছর ছিলেন সেখানে।

আসলে তিনি যখন যেখানেই বাস কন, আসলে থাকতেন তাঁর সেই নিজস্ব জীবনে। গল্পে আড্ডায় হাসি-হাসি ভঙ্গিতে তিনি মাঝেমাঝেই বলতেন, আমি যখন কলকাতায় বাস করতাম, আসলে তখন থাকতাম যশোরে। আবার প্যারিসে বা এলাহাবাদে বাস করার সময় থাকতাম কলকাতায়। কলকাতা বা যশোর যা ছিল আসলে বাংলা, সেই বাংলার ছোঁয়া তাঁর কাছে জীয়নকাঠির স্পর্শের মতো। সে স্পর্শে তিনি বাঁচতেন। জেগে উঠতেন, সৃষ্টি করতেন।

এইখানে এসে মাইকেল মধুসূদনের কথা মনে পড়ে যায়। ভাষা নিয়ে গোলযোগের যে-বিপদে পড়েছিলেন মাইকেল, তা কাটিয়ে উঠে তিনি যখন ফিরে এলেন তাঁর মাতৃভাষার কাছে, তখনই কবি হয়ে উঠলেন তিনি। ভগীরথের মতো বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে মাথায় করে নিয়ে বইয়ে দিলেন সাগরের দিকে।

অণ মিত্র যখন বাংলায়, বাংলার মাটির কাছে ফিরে এলেন, বাস করা আর থাকার মধ্যে গোল যখন মিটল শেষপর্যন্ত, গঙ্গার মতোই বইতে লাগল তাঁর সৃজনের ধারা। আমরা তাঁর পাঠকরা কৃতার্থ হলাম।

প্রথম গ্রন্থের পর ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৮ মোট তিরিশ বছরে আমরা তাঁর কাছে পেয়েছি, একটি সংকলনসহ পাঁচখানি কবিতার বই 'উৎসের দিকে' (১৯৫৫), 'ঘনিষ্ঠ তাপ' (১৯৬৩), 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' (১৯৭০), 'অণ মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৭২-- শ্রেষ্ঠ কবিতার অধিকাংশই তখনও কবির বুকে নিদ্রা যাচ্ছে, জাগে নি) এবং 'শুধু রাতের শব্দ নয়' (১৯৭৮-- পরের বছরই, ১৯৭৯ সালে এই কাব্যগ্রন্থের জন্যে তাঁকে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দেওয়া হয়)।

এই সময় তিনি অনুবাদ করেন পাঁচখানি গ্রন্থ, 'ভারত আজ ও আগামীকাল' (১৯৬১), 'কাঁদি' (১৯৭০), 'সে এক ঝড়ো বছর' (১৯৭০), 'ভারতীয় থিয়েটার' (১৯৭৫), 'গাছের কথা' (১৯৭৫)।

মৌলিক প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদি এই পর্যায়ে আমরা একটিও পাই না।

কলকাতায় ফিরে পাকাপাকিভাবে 'কলকাত্তাইয়া' হয়ে ওঠার পর নদী বেগবতী হয়ে যেন দিকই বদলে ফেলে। তিনি তখন বাস করছেন এবং থাকছেন তাঁর সেই নিজস্ব জীবনে। জীয়নকাঠির ছোঁয়া যে পেয়েছে তাকে আর ঠেকায় কে?

১৯৭৯ থেকে ২০০০, মাত্র একুশ বছরে তিনি যেন অফুরান। তাঁর একটিমাত্র উপন্যাস 'শিকড় যদি চেনা যায়' (১৯৭৯) এই পর্যায়ের শুতেই লেখা হয়ে যায়। নূতন কবিতা ও সংকলন মিলিয়ে প্রকাশিত হয় তেরোখানি গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্যগ্রন্থ সাতখানি, এবং অনূদিত গ্রন্থ ছ'খানি--- মোট সংখ্যা সাতাশ। যেখানে তিরিশ বছরে পেয়েছি দশ, একুশ বছরে প্রাপ্তি সাতাশ।

কবিতাগ্রন্থ, 'প্রথম পলি শেষ পাথর'(১৯৮১), 'খুঁজতে খুঁজতে এতদূর'(১৯৮৬), 'যদিও আগুন ঝড় ধসা ডাঙা'(১৯৮৮), 'এই অমৃত এই গরল'(১৯৯২), 'টুনি কথার ঘেরাও থেকে বলছি'(১৯৯২), 'খরা উর্বরায় চিহ্ন দিয়ে চলি'(১৯৯৪), 'অন্ধকার যতক্ষণ জেগে থাকে'(১৯৯৬), 'গন্দোলা নয় ছন্দোলা'(১৯৯৮)।

কাব্যসংকলন 'অণ মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা'(নূতন প্রকাশনা, ১৯৮৫), 'আমি হাঁটছি রক্ত পায়ে' (১৯৮৮), 'কাব্যসমগ্র'---- ১ম খণ্ড(১৯৮৮), 'কাব্যসমগ্র'--- ২য় খণ্ড(১৯৯২), 'বুলার রাগমালা'(১৯৯৫), 'স্বনির্বাচিত কবিতা'(১৯৯৮)।

গদ্যগ্রন্থ 'ভারতবর্ষের সাপ'(১৯৮০), 'সৃজন সাহিত্য, নানান ভাবনা'(১৯৮০), 'ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে'(১৯৮৫), 'খোলা চোখে'(১৯৯৩), 'পথের মোড়ে'(১৯৯৬), 'সাহিত্যের দিগ-দিগন্ত'(১৯৯৭), 'কবির কথা, কবিদের কথা'(১৯৯৭)।

অনূদিত গ্রন্থ 'মায়াকোভস্কি'(১৯৭৯), 'সার্ত্র ও তাঁর শেষ সংলাপ'(১৯৮১), 'অন্য স্বর'(১৯৮৩), 'পল এলুয়ারের

কবিতা'(১৯৮৫), 'আরাগঁ'(১৯৯১), 'পাঁচশো বছরের ফরাসি কবিতা'(১৯৯৪)।
এই তালিকায় অউণ মিত্রের একখানি কবিতাগ্রন্থের উল্লেখ করা হয় নি, 'উচ্ছন্ন সময়ের সুখদুঃখ ঘিরে'(১৯৯৯)। আম ার পরম সৌভাগ্য গ্রন্থখানি তিনি 'জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় স্নেহাস্পদেষু'-কে উৎসর্গ করেছিলেন। জীবৎকালে প্রকা শিত এটিই তাঁর শেষ গ্রন্থ। এটি ধরে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা আঠাশ। এর বাইরেও আছে নানা পত্রপত্রিকা, সংকলন গ্রন্থে ছড়ানো তাঁর বহু কবিতা ও গদ্য।
অণদা এত লেখালিখি করেছেন। কত বিষয়ে কত বক্তৃতা করেছেন। কত মিছিল হেঁটেছেন। বহু সমাবেশ থেকেছেন। তিনি নিছক কবি বা গদ্যকার বা অনুবাদক ছিলেন না। নিজস্ব ভঙ্গিতে, নিজের মতো করেই তিনি ছিলেন 'অ্যাকটিভিস্ট'। রবীন্দ্রন াথ থেকে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার শিল্পীসাহিত্যিকরা এ-ব্যাপারে যে-ধারা রচনা করে গেছেন অণ মিত্র ছিলেন সেই ধারারই পুরোধা।
আবার তিনি ছিলেন পাকা এক খাঁটি শিল্পী। ফলে কোনোদিন কোনো গোঁড়ামি ঠাঁই পায় নি তাঁর ভাবনায়, কথায় বা ক াজে। নিজের জীবনদর্শনে তিনি আশ্চর্যভাবেই মিলিয়ে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রভাবনার সঙ্গে মার্কসভাবনা। যশোরের যে-কিশে ারটি একদিন নিঃশব্দে কিন্তু চিরকালের জন্যে বরণ করে নিয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে, সে-ই একদিন, আরও বড়ো হয়ে, পরিণত যুবক হয়ে, যোগ দিয়েছিল তিরিশের দশকের বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টিতে (১৯৩৫-৩৮)।
কোনো গোঁড়ামি ছিল না বলেই তিনি তাঁর মূল ভাবনা, আসল দর্শন, মানবিকতার আদর্শকে লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হতে না- দিয়েও অনায়াসে বদলে দিয়েছেন, নিতে পারতেন, তাঁর ভাষা, তাঁর ভঙ্গি, এমন-কি তাঁর ভাব ভাবনাও, সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে।
চল্লিশের দশকে কবি কথা বলতেন কিছু উচচকণ্ঠে, 'শত্ত মুঠোয় স্বর্গ ছিনিয়ে নেওয়া/ দেবতারা পারে ঠেকাতে আর কি বলো'?
তখন চারপাশে যুদ্ধ। তখন মানবতা অনাহারে মরছে ফুটপাথে, মন্বন্তরে। আবার তখনই জার্মান নাৎসিবাদ এক জাপানি ফ্যাসিবাদের বিদ্ধে জোট বাঁধছে মানুষ। সংগঠিত হচ্ছেন শিল্পী-সাহিত্যিকরা। গড়ে উঠছে কবি-সাহিত্যিকদের ফ্যাসিবিরে াধী সংঘ, প্রগতি লেখক সংঘ, গণনাট্য সংঘ। রাগী গদ্য লিখছেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিবাদে মুখর পদাতিকের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, এক কিশোর ক্রমাগত ঝলসে উঠছে বিদ্রোহের কবিতায়, তাঁর নাম সুকান্ত। সময়টাই তখন প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার আবেগে উত্তাল।
সেই উত্তাল সময়ে অণ মিত্র যে লিখবেন, 'প্রাচীরপত্রে পড়ো নি ইস্তাহার?/লাল অক্ষর আগুনের হলকায়/ঝলসাবে কাল জানো?'--- এ আর তেমন আশ্চর্য কী?
তারপর একসময় তিনি যেন স্থির হন, ধীর হন। তিনি যেন চিরায়ত ভারতবর্ষের জাগ্রত ও প্রশান্ত প্রজ্ঞার সংবাদ পেয়ে য ান, স্পর্শ পেয়ে যান। তার সঙ্গে অনিবার্যভাবেই যুক্ত হয়ে যায় তাঁর সেই নিজস্ব জীবনের ভাঁড়ার থেকে সংগৃহীত উত্তাপ। কবিতার নতুন ভাষা খুঁজে পান তিনি। আর আমরা শুনি তাঁর নিজস্ব স্বর যা আর কারও নেই, আর কারও মতো নয়। সে স্বর শান্ত গম্ভীর এবং গভীর। সে কণ্ঠ হালকা ভঙ্গিতে ভারি কথা বলতে জানে। শুধু জানে না, বলে এবং আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনি। অনুভূতির গভীরতা আর স্বভাবের অসীম সততা দিয়েই তিনি জিতে যান। আমাদের জিতে নেন।
সত্যিকারের শক্তিমান যে তাকে তো চেঁচাতে হয় না। চেঁচাতে হয় দুর্বলকে, চেঁচাতে সে বাধ্য হয়। অন্তরের শক্তিতে যে শক্তিমান সে ফিসফিস করলেই আকাশ চিরে যায়, পাহাড় ভেঙে পড়ে। অণ মিত্রের ভাষায়
'কথাগুলোর একেবারেই ভার নেই। পাতার মর্মরে মিশে যেতে পারে। অথচ তারা কল্লোল নিয়ে আসে। অথচ তারা ফুসফুসকে শ্বাসের কাছে ধরে দেয়। পালকের মতো কথা, তার মধ্যে পৃথিবীর নড়াচড়ার শব্দ।'
কিন্তু এর জন্যে যে অমিত শক্তি প্রয়োজন কবি তা কোথা থেকে পান?
পান তাঁর সেই জীবনের কাছ থেকে, সেই মাটি আর মানুষের কাছ থেকে--পান, যেখান থেকে চণ্ডীদাস পান, রবীন্দ্রনাথ প ান কিংবা প্রেমচন্দ। অথবা বিষ্ণু দে, তারাশংকর-বিভূতিভূষণ-মাণিকের মতো বাংলা ভাষার হীরেজহরতের দল পান। অণদা স্পষ্টই লিখেছিলেন,
'এই তো শ্বাস নেওয়ার মতো উচচারণ করছি মানুষ আমি তোমার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করতে পেরেছি, তুমি প্রসন্ন হও।'

কিন্তু কার প্রসন্নতা প্রার্থনা করেন কবি? কারা তারা?
'স্থলপথে জলপথে বেশির ভাগ মনোরথে
আমার বিপরিক্রমা শেষ হয়েছে।
কত অভিজ্ঞতা। সব আমি ঝুলি ভর্তি ক'রে
নিয়ে এসেছি আমার দুখিনী মাটির কোলে
খিদে পেয়েছিল খুব,
আমি ঝুলিটা পাশে রেখে
সাপটে সুপটে খেলাম খুদকুঁড়ো,
ভালোবাসার খাওয়া আমার
চোখের জলের নুন মাখা।
তারপর প্রাণের বন্ধুর মতো
হাঘরে হাভাতেরা আমার চারপাশে জড়ো হয়েছে।

ঘুমের আগে মাকে শোনাই নতুন রাজ্যগড়ার গল্প
বলি তোমার কপালের লিখন আমরাই লিখছি এখন
মা তুমি রাজমাতা হবে।'
এই তাঁর মানুষ, তাঁর মাটি, তাঁর মা--- বাংলা মা।
সম্পূর্ণ সাহেবি সফিস্‌টিকেশনের সূক্ষ্মতায়, কবিতায় সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বর নিয়ে, বুকের ভেতর শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের যাবতীয় উজ্জ্বল ঐতিহ্যের শেকড় ছড়িয়ে দিয়ে যে-বাঙালিটি আদ্যোপান্ত বাঁচতে জানতেন, বাঁচতেন এবং সাহায্য করতেন, তাঁর নাম অণ মিত্র।
মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে যে লাইনগুলি তিনি লিখেছিলেন তা আর কে-ই বা লিখতে পারতেন!
'চোখের পাতা বুজে যায় যাক। তা নিয়ে
আমার কী ভাবনা? সেখানে তো আমি
রেখেই দিলাম আমার বাংলাকে
চিরকালের জন্যে।'
এই লাইনক'টি লেখার পর কবির চোখের পাতা যখন সত্যিই বুজে যায়, বাংলাকে হৃদয়ের অলিন্দে বসিয়ে ২০০০ সালের অগাস্ট মাসে তারিখের শেষ পর্যন্ত তিনি যখন সত্যিই চলে যান, তখন, সেই চলে যাওয়া কি মানা যায়? কে পারে মানতে? তিনি তো লিখেছিলেন,
'আমি এত বয়েসে গাছকে বলছি
তোমরা ভাঙা ডালে সূর্য বসাও
অন্ধকার হয়েছে আর আমি নদীকে বলছি
তোমরা মরা খাতে পরী নাচাও

খরায় মাটি ফেটে পড়ছে আর আমি হাঁটছি রক্তপায়ে
যদি দু-একটা বীজ ভিজে ওঠে
হাঃ হাঃ যদি দু-একটা.....'
কবি তো নিসর্গ ভালোবাসেন। অণ মিত্রও বাসতেন। কিন্তু ফসলবিহীন মাঠ তাঁর সহ্য হয় না একেবারেই। তিনি চান 'একমাঠ ধান, 'অন্নহীন মানুষের জন্যে। তাই খরার দিনে নিজের রক্ত দিয়েও বীজ ভিজিয়ে দিতে পারেন, দিতে চান তিনি।
এমন কবি কি চলে যেতে পারেন? এমন চলে যাওয়া কি মেনে নেওয়া যায়?

আমাকে তাই লিখতেই হয়েছিল এই রকম কয়েকটা লাইন...
‘কতলোকে কত কী রটায়!
তাদেরই কেউ রটিয়ে দিয়েছে অণ মিত্র নাকি মারা
গেছেন।
এমন আহাম্মক কেউ আছে যে একথা বিশ্বাস করবে?
নববই বছরের যুবকটি রবীন্দ্রসদনে কবিতা পড়ার আগে সেই হাসিটি হেসে ঘোষণাই করে দিয়েছিলেন, ‘আজকাল আমি যা-তা লিখছি।’ বলে, যে-কবিতা পড়লেন তাতেও দেখি ঠাঁইঠুঁই মেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেইসব লোকজন। সেইজন্যেই বোধহয় কবিতাগুলো ম ম করছে মধুর গন্ধে।
এমন কবিতা যিনি লেখেন সে কবির কখনো কি মৃত্যু হতে পারে?

কতলোক কত কী রটায়?

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com